জগদ্বন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশনে কয়েক বৎসর

আশুতোষ ভট্টাচার্য

লেখক ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর কিছুদিন নরসিংহ কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তারপর আবার ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আশুতোষ কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকরূপে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কৃতী ছাত্র। এম. এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

আমি ময়মনসিংহে থাকিয়া পরলোকগত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সেক্রেটারী মহাশয়ের প্রেরিত নিযুক্তিপত্র পাইলাম এই স্কুলে হেড্ পণ্ডিতের পদে। কিন্তু পাশে সরু নিবে লেখা ছিল Panditji must join on the second, much depends on the first impression. Hdm. ভাবিলাম আমার কোন পূর্ব পরিচিত বন্ধুই হেড্ মাষ্টার নাকি? যা হউক, ২রা জানুয়ারীই আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, কেহই পূর্ব পরিচিত নন বটে, কিন্তু সবাই বন্ধু। ইহা ১৯২০ সালের কথা।

হেড্ মাষ্টার ৺সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কার্য্যদক্ষতা এবং গতিভঙ্গী বিস্মিত করিল। স্কুলের দুইপাশে ৩টা করিয়া ৬টা কোঠা, উপরেও তাহাই। তাছাড়া ছোট কোঠা ছিল ৬।৭ টা—অতিরিক্ত বিষয়গুলি তাহাতে শিক্ষাদান হইত। মাঝখানের পথ দিয়া দুই পাশের ক্লাসগুলির দিকে তাকাইতে-তাকাইতে তিনি যখন চলিতেন, তখন তাহার পদক্ষেপ অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিত। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কয়দিন দেখিলেন—শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না? উত্তর দিলেন ‘আমি ত ও বিভাগটাই আপনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছি।’ এক উত্তরে আপনার করিয়া নিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ২।৩ জন শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের সময়ে ‘আপনি ও-ক্লাস নিন, ও-কাজ করুন’ আবার যেই স্কুল ছুটী হইল—‘প্রফুল্ল, কালিদাসকে ডাক, এস মুড়ি খাই’। খবরের কাগজে মুড়ি, বাতাসা, নারিকেল, কলা লইয়া চলিল ‘মুড়ি-মহোৎসব’। তিনি রাজসাহী গভর্ণমেন্ট কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হইয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলের আবহাওয়া অনুকূল এবং সুস্থ করিয়া দিয়া গেলেন।

সহকারী হেড্ মাষ্টার ৺প্রফুল্ল কুমার সরকারের উপরে হেড্ মাষ্টারের কার্য্যভার পড়িল। ইনি অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানে সুদক্ষ ছিলেন। সর্ব্বোপরি ছাত্রগণের সহিত পরিচয় এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অধিকারী করিয়াছিল। তাঁহার ভাল-মানুষীর সুযোগ লইয়া দুইজন কেরানী, তাঁহারই দস্তখতে এমন অবস্থা করিয়া তুলিয়াছিল যে, কোনদিন তিনি হেড্ মাষ্টারের পদে প্রার্থী হইবেন না, স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। স্কুলের অনেক অর্থের অপচয় হইল। হেড্ মাষ্টার আসিলেন শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ। কেরানীও বদল হইল।

এই সময়ে স্কুলের বাড়ী বোর্ডিংসহ ‘কলিকাতা ইমপ্রুভ ট্রাষ্ট’ অধিকার করিল। নূতন বাড়ী তৈয়ারী করার অপেক্ষায় ৺নরেন মিত্রের বাড়ী ভাড়া হইয়া স্কুল চলিতে লাগিল। এই সময়ে স্থানের

অপ্রতুলতাবশতঃ সেই বাড়ীর বড় একটি রান্নাঘরে প্রথম শ্রেণীর ক্লাস বসিবার বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ব্যবস্থা মনঃপূত না হওয়ায় ছাত্রগণ ক্লাসেই গেল না। তাহারা তৎকালীন সেক্রেটারী পরলোকগত পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ জানাইল। অন্তর্গত সকল বন্দোবস্তে হেড্ মাষ্টারই 'সর্ব্বেসর্ব্বা' এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি সেক্রেটারীর মতানুসারেও ঘর পরিবর্ত্তন করিলেন না, কিন্তু একটা কাজ করিলেন। আমাদের পরামর্শে ঘরের সংস্কার করাইলেন। আমাকে বলিতেই আমি স্কুলের পরে ৪।৫ জন মিস্ত্রি মজুর লইয়া ঘরটাকে আবশ্যকমত ভাঙিয়াচুরিয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া এমন ভাবে চূণকাম করাইলাম যে সেই ঘরই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরদিন স্বচ্ছন্দে সেখানে ক্লাস বসিল, কোন গোলমাল নাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীমান্ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বয়স কয়েকমাস কম পড়িয়াছিল। তখন ১৬ বৎসর না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রদের উপস্থিতি বিধিবহির্ভূত ছিল। শ্রীমানের ভাল ফল করিবার সম্ভাবনায় অনেকেই ৺মুরলীবাবুকে একখানি চিঠি দিয়া বয়সটা একটু বাড়াইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি ধীর-স্থির। বলিলেন—একটা মিথ্যার উপরে ছেলেটির জীবনের আরম্ভ হইবে? দরকার নাই। তিনি চিঠি দিলেন না, কাজেই শ্রীমানকে এক বৎসর বিলম্ব করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইল, সে ১৯২২ সালের কথা।

১৯২০ সালেই এই স্কুলের সহিত 'শীতল চতুষ্পাঠী' নামক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত নৃত্য গোপাল পঞ্চতীর্থ ইহার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অনেকে আপত্তি করিলেন 'ইংরাজী স্কুলের সহিত টোল কেন থাকিবে?' কর্ত্তৃপক্ষের আমার উপরে বিশ্বাসবশতঃ আমি 'ট্রাষ্ট্ ডিড্' দেখিতে পারিয়াছিলাম। আমি বলিলাম 'চতুষ্পাঠী হইতে না পারিলে, স্কুলও ভিত্তিহীন হইতে পারে। কোন বাধা নাই'। সেক্রেটারী পণ্ডিত ৺রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ আমার সহিত টোল সম্বন্ধে অনেক সময় আলোচনা করিতেন। দাতা স্বর্গীয় ৺জগদ্বন্ধু রায় আশা করিয়াছিলেন এই স্কুল একটি কলেজে পরিণত হইবে। তিনি বলিতেন 'সাউথ সাবারব্যান স্কুলটা কলেজ হইল, আর আমাদের কমিটি (Managing Committee) কি করে? কোন চেষ্টা নাই।' তিনি তৎকালীন সাউথ সাবারব্যান কলেজ (বর্ত্তমান আশুতোষ কলেজ) কে বলিতে 'সুবার্বন্ কলেজ' একেবারে 'শুবার্বন্'।

সকলেরই স্নেহ-প্রীতি পাইয়াছিলাম। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতেন আমি স্কুলকে আপনার জিনিষ মনে করিয়া ইহার উন্নতি কামনা করিতাম। তাই আমার বিশেষ প্রয়োজনে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হইতে আমার চাঁদা ত বটেই স্কুলের চাঁদারও অধিকাংশ আমাকে ধার দিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন এমনি মহানুভব!

স্কুলের বেতন তখন সকলেরই অল্প ছিল। প্রতিবৎসর বেতন বৃদ্ধি নিয়ম ছিল বটে কিন্তু হইত না। আর্থিক অবস্থার প্রতি বোধ হয় কেবলমাত্র শনির নহে, রাহুকেতুরও প্রভাব ছিল। একবার বেতন কমাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। আমাদের ত চক্ষুস্থির। আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম—'প্রফুল্লবাবু, (অঙ্কের লোক! বড় হিসাবী) আমাকে স্কুলটা ইজারা দিন, বেতন কমান দূরের কথা, একটা বার্ষিক

বৃদ্ধি দিব, হিসাব হইতে দেখাইয়া পাঁচশত টাকা লইব। না পারিলে কিছুই চাই না।' হেড্ মাষ্টার কামিনীবাবু প্রতিদিন ৪টা ৬ মিনিটের কলিকাতার গাড়ী ধরিতেন প্রফুল্লবাবুও অবসর পাইতেন না। ফলে কেরানীগণের সমৃদ্ধি! আবার তহবিল তছরুপ। বলিতে ভুলিয়াছি—কামিনীবাবু প্রফুল্লবাবুর উপর হিসাব রাখার দায়িত্ব দেওয়াইয়াছিলেন। গোলমাল পাকিয়া উঠিতে বাহিরের অডিটর নিযুক্ত হইলেন। কেরানীরা ছুটী লইলেন। স্কুল বিপর্য্যস্ত। প্রফুল্লবাবু আমাকেই সাময়িক হিসাব রক্ষার ভার দিলেন। এই 'অস্তি গোদাবরী তীরে' কে দিয়া হিসাব রক্ষা! প্রফুল্লবাবুর ব্যবস্থা, উপায়ান্তর নাই। আমি বলিলাম 'হেড্ মাষ্টার মহাশয় যদি প্রতিদিন হিসাবের জমা খরচ দেখেন, টাকা নেন, তা চারটাই হউক আর পাঁচটাই হউক, তবে পারি।' তাই স্বীকার। প্রফুল্লবাবুর অনুরোধে এবং সাহায্যে পূর্ণ তিনমাস কেরানীর চেয়ারে কাটাইলাম, আমার শিক্ষণের কাজ অন্য অন্যকে দিলেন। বেশ টাকা জমিল। কেরানীদের আর আসিতে হইল না।

সেই আর্থিক অসচ্ছলতার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন বিরাট সৌধে বিভিন্ন বিভাগে সুপণ্ডিত শিক্ষকগণের সযত্ন শিক্ষাদানে, স্কুল নানা দিকে উন্নতি করিয়াছে। সুদক্ষ হেড্ মাষ্টার মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকগণের সানুরাগ সহযোগিতায় বহুদিন হইতেই জগদ্বন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন (সেকালের 'জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন') দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম প্রধান বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, ভয় হয়। দেশের অবস্থার, ছাত্রগণের অবস্থার বড়ই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমরা ছাত্র সাধারণের নিকট হইতে যে প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিলাভ করিয়াছিলাম—যে শ্রদ্ধার আকর্ষণে ১৯৩১ সনে কলেজের কাজ ছাড়িয়া আবার স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, বর্ত্তমান শিক্ষকগণ ততোঽধিক শ্রদ্ধাভক্তি এবং ছাত্রগণ ততোঽধিক স্নেহলাভ করুন। শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সাগ্রহ সহযোগিতায় এই বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শ্রীবৃদ্ধি হইক, ইহাই ৺ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।